ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

শওকত আলীর *দক্ষিণায়নের দিন*: নারীর 'আমিত্ব' ও চরিত্রায়ণ

*চন্দন আনোয়ার

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী শওকত আলীর গল্প-উপন্যাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ নারীর অধিকারবোধ ও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। তাঁর তিনখণ্ডের দীর্ঘায়তনের উপন্যাস 'দক্ষিণায়নের দিন'-এ এক নারী নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছে। দীর্ঘকালের লালিত অভ্যাসচক্র এবং নারী সম্পর্কে পুরুষতান্ত্রিক মনোবৃত্তির অনেক ধারণাই শওকত আলী ভেঙে ফেলেছেন। বিশেষত, প্রধান চরিত্র রাখীর আত্মপরিচয়জনিত সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য চারপাশের বৈরী বাস্তবতার সাথে অপরাজেয় অবিচল সংগ্রাম, এবং শেষ পর্যন্ত আত্মবিজয়ের মধ্যদিয়ে বাঙালির নারীচৈতন্যের নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটেছে। প্রবন্ধটিতে ষাট ও সত্তরের দশকে নারীর আত্মসংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 'আমিত্বের' বিকাশের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

উপন্যাস এই পৃথিবীর ফাঁদে পড়া মানুষের জীবন নিয়ে তদন্ত, লেখকের জবানবন্দি নয়- মিলান কুন্ডেরার এই উক্তিটি উপন্যাসের চরিত্রায়ণের প্রধান একটি মাপকাঠি। ব্যক্তি তার চারপাশের চলমান বাস্তবতার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যায়; এ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে চিহ্নিত অথবা নির্ণীত হয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, অস্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি। ব্যক্তির অস্তিত্ব একটি নির্দিষ্ট সময়-চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই, গল্প-উপন্যাসের চরিত্রায়ণ অর্থই হচ্ছে সময়ের অন্তর্গত ব্যক্তির জীবন-বিন্যাস ও তার সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলি। আবার, এই ব্যক্তিসত্তার নির্মাণ কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নেই। এই মূহর্তের যে মানুষটি, সে বহু কালের বহু মানুষের অংশগ্রহণে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার একটি ধারাবাহিক অংশ। তার চিন্তা-দর্শন, তার বিচরণক্ষেত্র, তার জীবন-ঐতিহ্য নির্মাণে অতীত উপাদানগুলো তার ব্যক্তিসত্তার ভিত্তিভূমি। তাই, কথাশিল্পী মাত্রই কালনিষ্ঠ হয়। কারণ সমকালকে ধারণ করতে না পারলে উপন্যাস বাঁচে না। বিপরীতে, এ সত্যও কথাশিল্পীকেই মনে রাখতে হয়, শুধুমাত্র সমকালকে আঁকড়ে থাকলে উপন্যাস বাঁচে না। শওকত আলীর শিল্পসত্তার মৌলিক প্রবণতা ইতিহাসনিষ্ঠা ও কালনিষ্ঠা। এ প্রবণতার পূর্ণ রূপ দেখতে পাই তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস 'দক্ষিণায়নের দিন' (দক্ষিণায়নের দিন, কুলায় কালস্রোত', পূর্বরাত্রি পূর্বদিন) উপন্যাসের আখ্যান ও চরিত্র-নির্মাণে। তিনি সময়-অন্বিষ্ঠ ব্যক্তির আত্ম-আবিষ্কার বা রহস্য উন্মোচনের উদ্‌গ্র বাসনাকে শৈল্পিক নিরাসক্তি ও নির্মোহতা নিয়ে দেখেছেন। ষাটের দশকের ব্যক্তি মানুষের ভেতর-বাইরের দ্বন্দ্ব, আত্ম-জিজ্ঞাসা, ও আত্ম-আবিষ্কারের সাথে উঠে এসেছে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন, বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রটির জন্মের ইতিহাস, মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ এবং নব্য পুঁজিপতির উত্থান ইত্যাদি। বস্তুত, 'এই উপন্যাসের কাহিনীর প্রধান প্রবাহ এক খণ্ডিতা রমণী রোকেয়া আহমেদ রাখীর আত্মজীবন, তার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের রক্তক্ষরণ।'[১] ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিকাশ এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হওয়ায় এবং ব্যক্তি ও সমাজের রূপান্তরক্রিয়া একইসঙ্গে সংঘঠিত হওয়ায় অনিবার্যভাবেই একটি নিদিষ্ট কালখণ্ড বা অবিনশ্বর সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

* চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের জটিল, দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা।

> আপাতদৃষ্টিতে এই ত্রয়ী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও উপন্যাস-কাহিনির প্রধান প্রবাহ রোকেয়া আহমদ রাখীর আত্মজীবন, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্ত মনে হলেও এ-ট্রিলজির কেন্দ্রীয় নায়ক মূলত প্রবহমান সময়খণ্ড। যে সময়খণ্ডের ভেতর ষাটের দশকের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল আবর্তিত, যে কালখণ্ডের ভেতর জাতিসত্তা অন্বেষণে তরুণসমাজ মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায়, আত্মপরিচয়ের সঙ্কটে বিচলিত, সেই সময় ও কালের 'বস্তুময় জীবনদৃষ্টি; সমাজ-অভিজ্ঞান ও ইতিহাসজ্ঞান' এই ট্রিলজির অন্তঃশীল রহস্য।[২]

'রাখী, এবার কী করবে?' আপাত এই একটি প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনেকগুলো জিজ্ঞাসাচিহ্ন। চারদিক থেকে উচ্চারিত এই প্রশ্নটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাখীর মধ্যে যে ভাবনাগুলো জন্মায়; এবং সে যে সময়ের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে আছে, এর সাথে জড়িয়ে আছে বিকাশমান বাঙালির মধ্যবিত্তের জীবন-ইতিহাস। মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্য হয়ে উঠেছে, এই গল্পের সাথে ষাটের দশকের মুসলিম সামাজিক বাস্তবতার ইতিহাস মিলিয়ে দেখলে, দ্বিধান্বিত রাখীর আত্ম-অন্বেষণের গতিধারা নির্ধারণ করা সহজ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখীর জীবনে প্রেমে আসে নি। একটি ছেলের ভালোবাসার উন্মাদনার স্মৃতি ছাড়া রাখীর প্রেমের সুখ-স্মৃতি নেই। সহপাঠী বান্ধবীর প্রেমেও খুব বেশি আলোড়ন নেই রাখীর ভেতরে। কেন নেই? এই প্রেম না আসাটা কি স্বাভাবিক? প্রেমের আবেগ-উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা থেকে দূরে থাকা রাখীর জীবনে ঠিক সেই সময়ে প্রেম এসেছে, জীবনের যে সময়ে প্রেমের কথা ভাবলেই জড়িয়ে পড়ে শরীর, বিয়ে, অর্থ-বিত্ত-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি স্বার্থ-শর্ত। এসব স্বার্থ-শর্তের বাইরে কেন যাবে রাখী?

জীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা প্রয়োগ করেছে রাখী। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক জামানকে ভালোবাসা এবং বিয়ে পর্যন্ত টেনে নেবার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। কিন্তু জীবনের প্রকৃত-পাঠ কি রাখী নিয়েছে? জামানের লাম্পট্য ও শরীর-লিপ্সাকে রাখী প্রেম ধরে নিয়েছে। জামানের শারীরিক আগ্রাসনকে অবজ্ঞার পরিবর্তে প্রশ্রয় দেবার মধ্যে দিয়ে সংঘটিত ভুলটি কি রাখীর আর এক নিয়তি অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়ের নিয়তি? নাকি রাখীর সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা অপরিপক্ব, পুরুষতান্ত্রিকতার জালেই বন্দি? পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাকে যেভাবে ভেবে আসছে, তারই প্রতিফলন ঘটে গেল কি না রাখীর মধ্যে। শরীর-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা, নিরাপদ ভবিষ্যৎ, পরিবার-সমাজ-ধর্মের রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িয়ে আছে নারীর বিয়ের সাথে। এসবই আবার অধিকাংশ নারীর 'ব্যক্তি' হয়ে উঠার পথে প্রধান দেয়াল। জামানের সাথে রাখীর সংসার জীবন মাত্র কয়েকদিনের। এ ক'দিনে শরীর শরীর খেলা ক্লান্তি আর অবসাদ ছাড়া সুখ-স্বস্তি পায়নি। বস্তুত, রাখীর শরীরটাকে ঘিরেই জামানের সমস্ত পরিকল্পনা, বিন্দুমাত্র প্রেম ছিল না, সবই ছিল আরূঢ় ভণিতা। প্রেম-উন্মদনায় অন্ধ হয়ে সবকিছু বিলিয়ে দেবার মতো আবেগ রাখীর কখনই ছিল না। জামানের প্রতি খুব বেশি আকর্ষণ অর্থাৎ অপ্রতিরোধ্য অমোঘ টান বলতে যা বোঝায়, শারীরিকভাবে ঠিক সেরকম টানও লক্ষ করি না। সুখ-

সংসারের স্বপ্নও দেখেনি তেমন। রাখীর দিক থেকে বিয়েটা স্রেফ তার 'ব্যক্তি' হয়ে উঠার পথে পরীক্ষা মাত্র। অবশ্যই এই পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন ও প্রায় অলঙ্ঘনীয় ছিল।

নারীর আলাদা সত্তা বা অস্তিত্ব নেই, তার নিজের বলে কিছুই নেই, তার অস্তিত্ব বিলিয়ে দেয় স্বামী-সংসার-সন্তানের মধ্যে। নারীজীবনের চিরায়ত শৃঙ্খল ভাঙার মতো দুঃসাহস কি রাখে রাখী? সমগ্র উপন্যাসটি রাখীর আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রশ্নবাণে ভরপুর। জীবন নিয়ে এতো ভাবনা, এতো জিজ্ঞাসা, এতো দ্বিধা, আর এতো পতন-উত্থানের মধ্য দিয়ে যে রাখী এগিয়েছে, রাখীর জীবনগতি নিয়ে একটি মুহূর্তের জন্য পাঠক নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এর কারণ, রাখী ক্রমাগত সামনে এগিয়েছে বটে, কিন্তু পেছনের কিছুই সে ফেলে যায়নি। যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় আকস্মিক উদ্ধত যে ছেলেটি, 'একদিন নির্জন সিঁড়িতে হাত চেপে ধরে বুকের কাছে টেনে নিতে চেয়েছিল রাখীকে'; এবং রাখীর চিৎকার-কান্নাকাটিতে লোকজন ছেলেটিকে বেদম প্রহার করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া করেছিল, সেই ছেলেটির কথাও ভোলেনি।

জামান ও সেজানকে ঘিরে রাখীর দোটানা ভাব কখনও কখনও শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের অচলার কথা মনে করিয়ে দেয়। যেমন, 'হাঁটতে হাঁটতে নিজের দিকে মন ফেরাল রাখী। কোনদিকে যাবে সে? ঘড়িতে এখন সাড়ে ছ'টা– গেলে জামানকে এখন য়ুনিভার্সিটিতে পাওয়া যাবে। যাবে সেখানে, না যাবে সেজানকে খুঁজতে? গোপীদত্ত লেন, নাকি য়ুনিভার্সিটি? কোনদিকে যাবি তুই এখন রাখী।'[৩] 'গৃহদাহ' উপন্যাসের মহিম-অচলা-সুরেশের ত্রিভুজ প্রেমের গল্পের প্রতিরূপ গল্পই বলা যায় সেজান-রাখী-জামানের গল্প। কিন্তু এই দুই গল্পের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি রচনা করে রাখীই। অচলার চেয়ে রাখীর ব্যক্তিত্ব, বিচারবোধ ও জীবনবোধ অনেকাংশে প্রবল। রাখীর আত্ম-আবিষ্কারের তীব্রতাও অচলাকে ছাড়িয়ে যায়। অচলার দ্বৈধসত্তা পেণ্ডুলামের মতো ঘুরে মহিম-সুরেশকে ঘিরে, নিজের মনের উপরে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কাউকে ছাড়তে রাজি নয়। রাখীর মধ্যেও দ্বিধা-দ্বৈধতা প্রবল, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিও রাখে নিজের মধ্যে। জামানকে ভালোবেসে বিয়ে করার মধ্যে কোন প্রকার দ্বিধা ছিল না। জামানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সেজানকে কাছে টানার মধ্যেও কোন প্রকার দ্বিধা নেই। একই দেহে তো নয়ই, একই মনে দুই পুরুষকে বেশিক্ষণ রাখেনি। পেছনের সব কিছুই স্মৃতি, তাই স্রেফ স্মৃতির অংশ হয়ে উঠেছে। ঢাকা ছেড়ে ঠাকুরগাঁও যাবার কালে সকলের কাছে থেকে বিদায় নিলেও স্বামী অর্থাৎ 'জামানে'র কাছে থেকে বিদায় নিতে ভুলে যায়। এক সময় দেখা গেল, 'জামান' নামটি পর্যন্ত রাখীর জীবনে স্মৃতির অংশ হয়ে ওঠে।

রাখীর জীবনীশক্তি এতোই প্রবল যে, শূন্যতাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে রাখী যখন নিঃস্ব, জামান নেই পাশে, বাবা ভেঙে পড়েছে, একমাত্র বোন পাগলাখানায়, তখনও কিন্তু পাঠকের বিশ্বাস জেগে থাকে রাখী ঘুরে দাঁড়াবে। শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ ভঙ্গুর ক্ষয়িষ্ণু হতাশাগ্রস্ত রোগাক্রান্ত বাম বিপ্লবী রাজনীতি করা সেজানকে আশ্রয়-প্রশ্রয়-সেবা-ভালোবাসার মধ্য দিয়ে রাখী জীবনের নতুন খাতা খুলে বসে। ঠাকুরগাঁও কলেজে শিক্ষকতার সময় মরণাপন্ন সেজানের সেবা এবং চাকুরি ছেড়ে সেজানকে নিয়ে

ঢাকায় আসার মধ্যে দিয়ে রাখী জীবনের নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এবার রাখীর জীবনের ধারাপাত সম্পূর্ণ। নিজের মুখোমুখি হয়ে 'পদে পদে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া'র দিন শেষ রাখীর জীবনে। নিজেকে চিনে ফেলেছে রাখী। এখন আর কোন দ্বিধা নেই, জিজ্ঞাসা নেই, সঙ্কোচ নেই, ভয় নেই। সমগ্র শক্তি আর অস্তিত্ব নিয়ে আত্মসমর্পণের জন্য লুটিয়ে পড়ে সেজানের বুকে। সেজানও তার সামর্থ্যশক্তি দিয়ে রাখীকে আশ্রয় দেয় আপন বুকে।

> সারাটা বাড়ি একদম নিঃশব্দ, তখন যেন বুকের ঢাকনা খুলে গেল রাখীর। দ্যাখো, তুমি আমার দিকে দ্যাখো। আমার দাঁড়াবার কোন জায়গা নেই, আমার ভাই অহেতুক মরে গিয়েছে, আমার বোন পাগল হয়ে মরার দিনগুনছে, আব্বার মুখের দিকে তাকানো যায় না, আমার সন্তান এসেও এলো না। দ্যাখো, তুমি আমাকে ভালো করে দ্যাখো।
>
> সেজান রাখীকে বলছে, রাখী আমি জানি, আমি সব জানি।
>
> কিন্তু রাখী যেন শুনতে চায় না সে কথা। বলে, না, শুধু জানলে হবে না। তোমাকে দেখতে হবে। আমার মনকে পায়ের তলায় মাড়িয়েছে সবাই, আমার শরীরকে কলঙ্কিত করেছে, আমার নামে অপবাদ দিয়েছে আমি এখন কি করব বলো। আমাকে দ্যাখো আর বলো। বলো, আমি এই জীবন নিয়ে কী করবো?
>
> বাইরে বৃষ্টি আরো তুমুল হয়। সেজান রাখীকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। চুমু খায় কপালে, চোখে, মুখে, বুকের মাঝখানে। তারপর ঐ সময় ঐ উত্তাল মুহূর্তগুলোতে রাখীর মনের মতো শরীরও সকল দল মেলে দেয়। ফুলের মতোই ফুটে রাখী সেজানের দুই হাতের মধ্যে। সেজানকে তখন গ্রহণ করতে হয় আর নিজেকে রাখীর তখন নিবেদন করতে হয়। এ গ্রহণ যেমন নিঃশেষে, নিবেদনও তেমনই নিঃশেষে।
>
> রাখী সেদিন থাকল, পরের দিন থাকল এবং তারপরের দিনও।[৪]

এই মিলনোত্তর রাখী এবং সেজানের সন্তানের গর্ভধারিণী রাখী একজন পূর্ণ নারী, পূর্ণ মানুষ, পূর্ণ সত্তা, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একজন ব্যক্তি। জামানের সাথে রাখীর প্রেম-বিয়ে দৈহিক ও সামাজিক শর্তাধীন; এ প্রেমে সমর্পণ নেই, আছে শুধু আদিম জৈবিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন রাখীর জীবনে ফুরিয়ে যায় কয়েকদিনেই। তাই, সেজানের প্রেম রাখীর জীবনকে আলোকিত বা আশান্বিত করে। সেজানের প্রেমে দেহ আছে, পাশাপাশি আছে সমর্পণ ও বিশ্বাস। সেবা, ত্যাগ, স্বপ্ন, নির্ভরতা ও নিঃশেষে সমর্পণের মধ্যে পূর্ণতা পায় যে প্রেম, সেই প্রেম রাখী সেজানের কাছেই পেয়েছে। তাই, সেজানকে বিয়ে প্রসঙ্গে রাখী বলে, 'তাহলে সেজানকে পেতাম না। সেজানদের কি সহজে পাওয়া যায়?' বরং সেজানের কাছে যা পেয়েছে তিনদিনের মিলন, গর্ভের সন্তান হোক তা প্রচলিত ধারণায় অবৈধ বা অস্বীকৃত রাখীর জীবনে তাই অমূল্য প্রাপ্তি, অবলম্বন। সেজানের প্রেম, মিলন-স্মৃতি ও সেজানের সন্তানকে সমাজ-শাসনের ভয়ে আড়াল করেনি রাখী। বরং সগৌরবে প্রকাশ্যে নিজের মাতৃত্বকে ঘোষণা করে, 'রাখীর ঈষদোন্নত পেটের দিকে যখন কেউ তাকায় রাখীর সঙ্কোচ হয় না। ভারী কোমল হাসি খেলে যায় রাখীর মুখে। গর্ব এসে বুকের ভেতরটা ভরে দেয়। কেউ যেন বলতে চায়– দ্যাখো, আমি ফুরিয়ে যাইনি, হারিয়ে যাইনি, আমি এবার আর ভুল করিনি।'(পৃ. ৩৮০) নিজের অস্তিত্বের সপক্ষে, সমাজ-ধর্মের নীতি-শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এমন দৃঢ়ভাবে একজন বাঙালি মেয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারে একথা ভাবলেই বিস্ময় জাগে। জামান-হাসান-মাজহারদের মতো স্খলিত নষ্ট মনুষ্যত্বহীন মানুষদের অধীনে থাকা স্বার্থান্ধ সমাজের নীতি-শাসনের বিরুদ্ধে নিজের ক্রোধ প্রকাশ, প্রতিবাদ ও প্রতিশোধের জন্য এর

চাইতে বড় অস্ত্র আর কি হতে পারে? বান্ধবী সুমি সন্তানের পরিচয় প্রশ্ন তুললে, 'রাখী শুনে বিচিত্র হাসে। বলে, সুমি আমাকে তুই ওসব কি বোঝাস বল? আমার ছেলের পরিচয় কি হবে জানিস না তুই। কী মনে করিস, আমি কিছু লুকোবো? নিজের রক্তের কাছে কিছু লুকানো যায়? বিশ্বাসের কাছে কি ছলনা চলে? দেখি, আমি যেমন এখন লুকোই না, তখনও লুকোব না। তোদের সংসারের নিয়মকানুন কী হল না হল, তাতে আমার ভারী বয়ে গেল।'[৫]

একমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের একাংশ পূর্ব পাকিস্তানের জনজীবনে দুঃসহ দুঃস্বপ্ন নেমে এসেছিল। বাঙালির সম্পদ-সম্ভ্রম-স্বাধীনসত্তা কোনকিছুই নিরাপদ ছিল না পাকিস্তানিদের কাছে। বরং ভয়াবহ শোষণ আর জবরদস্তির ছিল। তাই, ধর্মের বন্ধনকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বাঙালি জাতিসত্তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন ছিল। রাখী বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতীক চরিত্র। জামানের সাথে রাখীর বন্ধন ধর্মের, কিন্তু এই বন্ধন রাখীর স্বাধীনসত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়। রাখীর প্রেম, বিশ্বাস, শরীর, সম্ভ্রম কোনকিছুই জামানের কাছে নিরাপদ নয়। নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে হবে রাখীকে। স্বাধীনসত্তা গড়ে তোলার জন্যে রাখীর লড়াই আর বাঙালির স্বাধিকার লড়াই এক সঙ্গে চলে। সমার্থক হয়ে ওঠে দুটি লড়াই। নিজের সমৃদ্ধির জন্য রাখীর গর্ভের সন্তানকে বাধা মনে করে জামান। অর্থাৎ রাখীর সাথে জামান শুধু শারীরিক বন্ধনটাকেই টিকিয়ে রাখতে চায়। দুর্ঘটনায় গর্ভের সন্তান নষ্টের পরে, রাখী যখন হাসপাতালের বেডে, তখন জামানকে ডাকার কথা বললে, রাখী বলে ওঠে, 'জামান, কোন জামান?' এবং পরে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে জামানের উপস্থিতি। রাখীর এই প্রত্যাখ্যানের দৃঢ়তায় ধর্মের বন্ধন নড়বড়ে হয়ে ওঠে। এরপর দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে রাখী 'ব্যক্তি' হয়ে ওঠে, যে ব্যক্তিটি ধর্মের নামে, সমাজ-ঐতিহ্যের নামে তৈরি হওয়া সমস্ত অচলায়তন ভেঙে, ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। সেজানকে ভালোবাসা, স্বেচ্ছায় দৈহিক মিলন, সেজানের সন্তান ধারণের মধ্যে দিয়ে রাখী চূড়ান্তভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছে ধর্মের বন্ধনকে। ঠিক এ সময় পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রচিত বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন চরমে এবং অদূরে বিজয়। বাঙালির স্বাধিকার চেতনার পতাকাবাহী সেজান পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়। কিন্তু সেজানের সন্তান রয়ে যায় রাখীর গর্ভে। যে সন্তান বাবার চেতনার উত্তরাধিকার বহন করবে। এজন্য রাখী তার সন্তানের নাম রাখবে সেজান। কারণ, সেজানদের দৈহিক মৃত্যু হলেও, তাদের বিপ্লবের মৃত্যু নেই। গর্ভের সন্তানকে শুনিয়ে রাখী বলে:

> দ্যাখ, এখানে আমি হেঁটেছিলাম–তুইও হাঁটিস এখান দিয়ে, এখানে দাঁড়িয়ে আমি মিছিল দেখেছিলাম–তুইও দেখিস এখানে দাঁড়িয়ে, সেজানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল এখানে, এই গাছতলায়–এখানে তুইও দাঁড়াস, আর এই যে রাস্তাটা, এই রাস্তায় সেজান মিছিল নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল–তুইও এই রাস্তা দিয়ে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাস, হ্যাঁ রে, পারবি তো?[৬]

এরপর রাখী শুধুমাত্র সেজানের সন্তানের গর্ভধারিণী নয়; বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির চেতনার গর্ভধারিণী হয়ে ওঠে।

রাখীর 'ব্যক্তি' হয়ে উঠার দীর্ঘ লড়াই সম্পূর্ণ করতেই লেখককে আরও বেশ কিছু নারী চরিত্র নির্মাণ করতে হয়। বুলু, পারভীন, ইভা, নার্গিস এরা কেউ শেষ পর্যন্ত 'ব্যক্তি' হয়ে উঠেনি। নিজেদের অস্তিত্ব চিন্তায় বিপন্ন এই নারীদের কেউ পাগল হয়ে পাগলা গারদে, কেউ বিয়ে করে প্রথাগত সংসার জীবনে, কেউ নিজের শরীরকে পুঁজি করে কোনমতে একটি আশ্রয়ের চেষ্টায় লিপ্ত। নব্য ব্যবসায়ী মুনাফা লোভী স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে আনার আকাঙ্ক্ষা থেকে ঘরোয়া মেয়ে বুলু ঘর থেকে বের হয়। ব্যবসায়িক স্বামী স্বার্থ সিদ্ধির ট্রামকার্ড হয়ে বিভিন্ন জনের কাছে নিজেকে বিলিয়ে, মদাসক্ত হয়ে অবশেষে স্বামীকেও হারায় বুলু। যে সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাখী স্বাভাবিক, নিষ্কম্প ও অটল, সেই একই সংকটের মুখোমুখি হয়ে বুলু অপ্রকৃতিস্থ। জামানের ঘরে নার্গিসকে আবিষ্কার করার পরে রাখী নির্বিঘ্নে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে এই বলে, ' কেন এত অস্থির হচ্ছো বলো তো? নার্গিসের সঙ্গে শুয়েছ বলে আমি রাগ করিনি, বিশ্বাস করো।' কিন্তু স্বামী হাসানের সঙ্গে মামাত বোন পারভীনের সম্পর্কজনিত কারণে বুলুর সন্দেহ ও আচরণ সম্পূর্ণ হিতাহিত রহিত, 'আচ্ছা, পারভীন কি বেশি আরাম দেয় তোমাকে, বলো না গো!' বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উচ্চাবিলাস বুলুর কখনই ছিল না। কিন্তু স্বামীর উচ্চবিলাস আর লোভের ফাঁদে পা ফেলে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করেছে। সন্তান নেই এবং হবার সম্ভাবনাও নেই, আবার স্বামীকেও ধরে রাখতে পারছে না, প্রচণ্ড মানসিক চাপে-আতঙ্কে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে বুলু। ঠিকানা হয় পাবনার পাগলাখানা এবং উপন্যাসের শেষে বুলুর মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ জানতে পারি।

রাখীর 'ব্যক্তি' হয়ে ওঠার ইতিহাস, ষাটের দশকে বাঙালির মধ্যবিত্তের বিকাশের ইতিহাস, আর বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাস এক আখ্যান-সুতোয় বাঁধা। ফলে আখ্যানের মূলধারার চরিত্রগুলো তো বটেই, অপ্রধান চরিত্রগুলোও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। নব্য ব্যবসায়ী হাসান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ অধ্যাপক জামান, বামপন্থী বিপ্লবী সেজান প্রত্যেকটি চরিত্রের লক্ষ্যবিন্দু স্বতন্ত্র। সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেণির মানুষ ব্যবসার মাধ্যমে রাতারাতি নব্যপুঁজিপতি হয়ে ওঠে। এই প্রলোভনে পড়ে তরুণ সমাজের একটি বিরাট অংশ সংক্ষিপ্ত পথে ধনী হবার স্বপ্ন নিয়ে চাকরি ছেড়ে ব্যবসার দিকে ঝোঁকে। হাসান উপলব্ধি করে, 'সমৃদ্ধির পথ ঐ একটাই। বহু ঠেকে সে শিখেছে–টাকাই হলো জীবনের সারবস্তু। একেক সময় আক্ষেপ করে সে চারদিকের অবস্থা দেখে। অতি তৃতীয় শ্রেণীর মূর্খ লোক দেখতে দেখতে ফুলেফেঁপে উঠছে। অর্থবান মূর্খ লোকেরাই সর্বত্র সম্মান পাচ্ছে, তাদেরই দাপট। তার সহপাঠী বন্ধুরা কতজন চাকরিতে না ঢুকে ব্যবসা আরম্ভ করে এখন দশ-বারোখানা করে বাড়ির মালিক, চার পাঁচখানা করে মোটর গাড়ি চালায় বউ ছেলেমেয়ে মিলে। কেউ কেউ বড় বড় ইন্ড্রাস্ট্রিতে গিয়ে এখন কোটিপতি। শুধু সে-ই মিছে মিছে সময় নষ্ট করেছে এতোকাল চাকরি করে।'[৭]

চাকরি আর করেনি হাসান। উত্তরোত্তর ব্যবসার সমৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে হাসান তার বাঞ্ছিত স্বপ্ন-সুখ-সমৃদ্ধির কাছাকাছি পৌঁছে যায় বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে। ব্যবসার পুঁজি হিসেবে স্ত্রীকে অন্য পুরুষের ভোগ্য করে তোলার মতো হীনতা ও অধঃপতনেও হাসানের মধ্যে কোন বিকার দেখতে পাই না। বুলুর মানসিক বৈকল্য, অসুস্থতা, পাগলাগারদে ঠাঁই,

পরিণতিতে মৃত্যুতেও হাসান নির্বিকার। অধিকন্তু পুঁজিপতি হয়ে ওঠার সাথে সাথে হাসানের নৈতিক স্খলন ঘটে। নব্যপুঁজিপতি শ্রেণির যা হয়।

যে কোন মূল্যে ও দ্রুততম উপায়ে পুঁজিপতি ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির একজন হয়ে ওঠার প্রবণতার কারণে বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশের মধ্যে হঠকারিতা ও প্রতারণা প্রবেশ করে। এই শ্রেণির একটি অংশই দুই ধারার রাজনীতি অর্থাৎ পাকিস্তানপন্থী ও পাকিস্তানবিরোধী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি প্রবলভাবে আপোষকামী ও যে কোন মূল্যে ক্ষমতাকে পাবার সহজ পথ-সন্ধানী। এই ধারার বাইরে, বামপন্থী রাজনীতি তৃতীয় আর একটি ধারা। শিক্ষিত, বিপ্লবী, স্বপ্নবাজ, দেশপ্রেমী তরুণসমাজের একটি বড় অংশ এই বামপন্থি ধারার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, এই ধারার নেতৃত্বে ছিলেন যারা, তারা জেগে ওঠা তারুণ্যের শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেননি। বরং নিজেদের গোপন স্বার্থে অর্থাৎ ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি আসক্তির কারণে সরাসরি বিপ্লবে যেতে চাননি। ফলে, তরুণদের স্বপ্ন ও বিপ্লব-আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ রূপান্তরিত হয় গভীর হতাশায়। তরুণ বিপ্লবী সেজানের উপলব্ধি :

> আমার কিছুতেই মিলছে না কারো সঙ্গে। একেকবার মনে হয়, সময় বোধহয় আমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। চিন্তাভাবনাগুলো পর্যন্ত তাল রাখতে পারে না। আবার একেক সময় মনে হয়–সবকিছু মনে হয় পিছিয়ে গেছে। চাকা উল্টোদিকে ঘুরলে যেমন হয়। এ খুব খারাপ অবস্থা– কী রকম পাগলা একটা সময় নির্বোধের মতো সবকিছুকে টেনে নিয়ে চলছে। অথচ কারো কিছু করার নেই। আমি যাকেই বলতে যাচ্ছি–দ্যাখো, এভাবে চলবে না। বাধা দাও, কিছু একটা করো– কিন্তু কেউ আমল নিচ্ছে না আমার কথায়।[৮]

হাতশাক্রান্ত তরুণরা বিশ্বাস হারিয়ে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। 'মানুষ সুখী হোক', 'মানুষের জীবন পরিপূর্ণ হোক' এই স্বপ্ন নিয়ে ব্যক্তিগত সমস্ত সুখ-বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে এবং নিজের শরীরের ভেতরের কঠিন অসুখ নিয়ে ক্লান্তিহীন-বিশ্রামহীন ছুটে ফিরছে সেজান, কিন্তু তার এই পথে নেই নেতারা। তারা জনগণের কথা বললেও বাস্তবে জনগণের চেয়ে নিজের কথাই ভাবে বেশি। বিশ্বাস হারিয়ে বন্ধু মনি বেশদিন বেঁচে থাকতে না পারলেও প্রবল আত্মপ্রত্যয়ী ও লড়াকু সেজান নিজের মধ্যে বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখে। এই বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখা তরুণরাই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সময় পাকিস্তানি বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে জীবন দিয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজের বিশ্বাসের প্রতি অটুট ছিল সেজান। দেশ ও মানুষের কল্যাণের জন্য উৎসর্গিত জীবনের সমাপ্তি ঘটে রাজপথে, পুলিশের গুলিতে। সেজানের চেতনা আর বিশ্বাসের পথ ধরেই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন পূর্ণতা পায় মুক্তিযুদ্ধে। সেজানদের জীবন ও চেতনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ।

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যবিত্তের বিকাশমান সমাজের যুবপ্রজন্ম রাখী-সেজান-জামান-হাসান। এদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছেন রাশেদ সাহেব। পুরনো বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে গেছেন তিনি। জীবনাভিজ্ঞতায় পূর্ণ বর্ষীয়ান এই মানুষটি যেভাবে জীবনকে দেখেন, যে মূল্যবোধগুলো লালন করেন, সেই মূল্যবোধ ও জীবনের শেষ প্রতিনিধি তিনি। তাঁর জীবনবোধ ও মূল্যবোধের উত্তরাধিকার নিতে অস্বীকৃতি জানায় তার সন্তানরা। কালের সাক্ষী এই মানুষটির চোখের সামনে দিয়ে তার সন্তানেরা

নগদ সুখ ও শর্টকার্ট ধনী হওয়ার লোভে সময়স্রোতের টানে হারিয়ে যাচ্ছে। 'মানুষ এই যে খালি দায় এড়িয়ে সুখের দিকে যেতে চাইছে–এ ভালো নয়। আসলে মানুষকে একটা লক্ষ্য খুঁজে পেতে হবে। একটা ভিত্তির উপরে মানুষকে দাঁড়াতে হবে।' সুখ-প্রহেলিকার পেছনে অন্ধভাবে ছুটে চলা ছাড়া কারও জীবনের কোন লক্ষ্য নেই। একমাত্র পুত্র বিপ্লবী রাজনীতিতে নাম লেখিয়েছিল। নেতাদের চরম স্বার্থপরতা ও সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে বিপ্লব করতে ব্যর্থ হয়ে শেষে হতাশা নিয়েই পৃথিবী ছেড়েছে। বড় মেয়ে বুলু প্রেম করে তার মতের বিপক্ষে গিয়ে জোরপূর্বক বিয়ে করেছে। শর্টকার্ট পুঁজিপতি হওয়ার লোভে ব্যবসায় নামে মেয়েজামাই। অধিক মুনাফার লোভে মেয়েকেও টেনে নেয় ব্যবসায়। স্বামীর নির্দেশে পরপুরুষের কাছে শরীর বিলিয়ে, মাদকাসক্ত হয়ে, অবশেষে স্বামী-পরিত্যক্ত হয়ে মেয়ের ঠাঁই হয় পাবনার পাগলাগারদে। সেখানেই মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্য ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম এ ছোট মেয়ে রাখী প্রেম করে বিয়ে করে এক শিক্ষিত লম্পটকে। তার চোখের সামনেই দুর্ঘটনায় মেয়ের গর্ভপাত ঘটে। এসবই ঘটে রাশেদ সাহেবের চোখের সামনে, সিনেমার মতো স্বপ্ন মনে হলেও সবই বাস্তব। তাঁর নিজের উপলব্ধি 'আমি শুধু শান্তি আর সুখ পেতে চেয়েছিলাম জীবনে। গ্লানি যেন না থাকে, অপমান যেন না থাকে, পাপ যেন না থাকে,–এই রকম একটা জীবন আমি পেতে চেয়েছিলাম! ভেবেছিলাম, ছেলেমেয়েরা পবিত্র হোক, সুখী হোক, কিন্তু ঐ যে বললাম, আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া আমার চিন্তায় ভুল ছিল। হ্যাঁ, এখন বুঝতে পারি। মানুষের নিজের জীবন শুধু নিজেরই নয়। নিজেকে সে আলাদা করে রাখতে পারে না। এ ভুলের জন্যই আমি ফেইল করলাম।' (পৃ. ৪৬) এই উপলব্ধি রাশেদ সাহেবের ঠিক তখনই ঘটে, যখন সব কিছু হারিয়ে তিনি নিঃস্ব, একা। প্রায় ভেঙে পড়া বিধ্বস্ত এই মানুষটি ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন হঠাৎ। পুলিশের গুলিতে সেজানের মৃত্যুর সংবাদ শুনে রাখী মূর্ছা গেলে মেয়েকে বুকে আগলে ধরেন।

> রাশেদ সাহেব এক সময় এগিয়ে এসে মেয়েকে তুললেন– পারেন না, শরীর কাঁপে, তবু তুললেন। তার শরীর প্রকাণ্ড দেখাল তখন, শাদা চুলে আলো, আর পিতা সন্তানকে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপর্যয়, ধ্বংস, কোলাহল, চিৎকার আর তাঁর মাঝখানে দুবাহুর ভাঁজের মধ্যে তুলে ধরা সন্তান নিয়ে মহাকালের যেন এক পুরুষ।
>
> কিছু বলতে পারল না কেউ। রাখীকে শুইয়ে দিলেন ঘরের ভেতরে। তারপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলেন, রাখী–রাখী চোখ ম্যাল্। রাখী তোর ছেলের জন্য তুই শক্ত হ।[৯]

'রাখী তোর ছেলের জন্য তুই শক্ত হ'মন্ত্রের মতো শোনায় বাক্যটি। রাখীর সন্তানকে স্বীকৃতিদানের মধ্যদিয়ে রাশেদ সাহেবের জীবনে নবজাগরণ ঘটে। নিজেই মেয়ের ডির্ভোসের ব্যবস্থা করে লন্ডনে জামানের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘ জীবনের সমস্ত বিষ উগড়ে ফেলে দিয়ে নবজাগরিত জীবন নিয়ে এবার মেয়ের পাশে দাঁড়ান রাশেদ সাহেব। এখন আর রাখী একা নেই। নির্মাত্রিক বা একমাত্রিক চরিত্র রাশেদ সাহেব রাখীর সন্তানের স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে পূর্ণমাত্রিক হয়ে ওঠেন। একইসাথে, দেশের স্বাধিকার আন্দোলনের সাথে নিজের সম্পৃক্তি রচনা করেন। প্রসঙ্গত সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্ট সুলামিথ ফায়ারস্টোন নারী নির্যাতন, নিগ্রহ ও অধস্তনতার কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নয়, চিহ্নিত করেন লৈঙ্গিক আধিপত্য। ঔপন্যাসিক

> শওকত আলী রাখীর ভূমিকার মধ্যে লিঙ্গবাদী সমাজের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতাকে বিপর্যস্ত করেছেন। সন্তান উৎপাদনের কারিগর রূপেই কেবল সমাজ নারীর ইমেজকে নির্মাণ করেছে, উপন্যাসে সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্ত জামানের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ক্ষমতায়নকে মৌন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে রাখী। ঔপন্যাসিক রাখীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা রূপান্বয়ের মাধ্যমে জেন্ডার ইক্যুয়ালিটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যদিও একটি উত্তেজনার ফলে দুর্ঘটনাবসত রাখীর গর্ভস্থ সন্তান মৃত্যুবরণ করে। মার্কসীয় নারীবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সন্তান উৎপাদনক্ষম বলেই এই ভূমিকা নারীকে যেমন গৃহবন্দি করে ফেলে তেমনি শ্রমবাণিজ্যে নারী হয়ে পড়ে মজুরিবৈষম্যের শিকার। সম্ভবত এ কারণে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত হওয়া সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক রাখীর গর্ভস্থ সন্তানকে ঠেলে দিয়েছেন মৃত্যুর অন্ধকারে এবং রাখীকে করে তুলেছেন বন্ধনহীন, সংশয়মুক্ত, দ্বিধা-উত্তীর্ণ। কেননা এর পরপরই আমরা দেখি রাখী অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করে চলে যায় ঠাকুরগাঁওয়ে।[১০]

উপন্যাসের চরিত্রায়ণের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রায় সবগুলোই শওকত আলীর 'দক্ষিণায়নের দিন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোতে বটেই, অপ্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যেও বিদ্যমান। প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বতন্ত্র, একেকটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করে। ঘটনা পরম্পরায় ক্ষণিক উপস্থিতি এমন চরিত্রও লেখকের সযত্ন প্রয়াস। তিনখণ্ডের দীর্ঘ কলেবরের এই মহাকাব্যিক উপন্যাসে সেই হিসেবে চরিত্রের সংখ্যা কম। প্রত্যেকটি চরিত্রই কাহিনি-বৃত্তের অংশ এবং পরস্পর সম্পর্কিত। আবার দু-একটি ছোট চরিত্র ছাড়া প্রত্যেকটি চরিত্র স্বাধীনভাবে বিকাশের সুযোগ পেয়েছে। কোন প্রকার প্রলোভন বা আতিশায্য চরিত্রগুলোর স্বধর্মচ্যুতি ঘটায়নি। চরিত্রগুলোর কেউ ভাগ্যের ওপরে জোর দেয়নি, নিজের লড়াইয়ের ক্ষেত্র ছাড়েনি। যে পরিস্থিতির ফাঁদে তারা পড়েছে, সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছে। প্রতিটি চরিত্র নিজের অস্তিত্ব নিয়ে শঙ্কিত; তাদের প্রত্যেকের মধ্যে অস্বস্তি, অসংখ্য জিজ্ঞাসাচিহ্ন। বিস্ময় ও বিশ্বাসের ঘাটতি কখনই ঘটেনি। লেখকের নির্ভীক নির্মোহ ব্যক্তিত্ব প্রতিটি চরিত্রের উপরে ছায়া ফেলেছে বটে, কিন্তু নিজের সৃষ্ট চরিত্রের কাছে থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেছেন লেখক। ফলে চরিত্রগুলোর বিকাশ বাধা পায়নি। রাখীর জীবননাট্যের প্রতিটি ঘটনা নাটকীয় দৃশ্যপটের মতো উন্মোচিত হয়, কিন্তু অতিনাটকীয়তা বা বাড়াবাড়ি নেই। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে একটি চরিত্রও নির্মাণ করেননি শওকত আলী।

তথ্যসূচি:

---

[১] শাফিক আফতাব, *শওকত আলীর উপন্যাস : কলাকৌশল ও বৈশিষ্ট্য* (ঢাকা : ভাষাচিত্র, ২০১৪), পৃ. ২৭

[২] মিল্টন বিশ্বাস, "দক্ষিণায়নের দিন-কুলায় কালস্রো-পূর্বরাত্রি পূর্বদিন : মহাকাব্যিক সময়সারণির ট্রিলজি" *গল্পকথা শওকত আলী সংখ্যা* (রাজশাহী : ২০১৬), পৃ.১৭১-৭২

[৩] শওকত আলী, "দক্ষিণায়নের দিন" *শওকত আলীর রচনাসমগ্র ২য় খণ্ড* (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ২০১৫), পৃ. ১১১
[৪] *তদেব*, পৃ. ৩৭২-৩৭৩
[৫] *তদেব*, পৃ.. ৩৭৯
[৬] *তদেব*, পৃ. ৩৮৯
[৭] *তদেব*, পৃ. ৯৭
[৮] *তদেব*, পৃ. ৭২
[৯] *তদেব*, পৃ. ৩৮৬
[১০] আবু হেনা মোস্তফা এনাম, "শওকত আলীর ত্রয়ী: কালের সিসিফাস", *গল্পকথা শওকত আলী সংখ্যা* (রাজশাহী: ২০১৬), পৃ. ১৮৯।